

জার্মান সাহিত্য প্রান্তর থেকে অধুনা

জার্মান সাহিত্য প্রারম্ভ থেকে অধুনা ড. মুকিদ চৌধুরী



আদিত্য প্রকাশ

আদিত্য

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশক
কাকলি বেগম
আদিত্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০৬৭৮৬০৪, ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
একমাত্র পরিবেশক
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
বানান সমন্বয়ক
আবু বকর সিদ্দিক
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : প্রব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ১৫০০.০০ টাকা

A brief History of German Literature

Dr. Mukid Choudhury

Published by Kakoli Begum

Adittya Prokash

38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 90678604, 01919664970
e-mail : adittya.prokash@gmail.com

Only Distributor

Anindya Prokash

38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970

First Published : February 2024

Price : 1500.00

US \$ 30

ISBN 978 984 97378 4 1

ঘরে বসে আদিত্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

<http://rokomari.com/adittyaapokash> ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭

<https://othoba.com> ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০

<http://boibazar.com/adittyaapokash> ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০

<http://bdshopay.com/adittyaapokash> ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

<http://porua.com.bd/adittyaapokash> ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৮৮৮

<http://journeybybook.com/adittyaapokash> ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

ଉତ୍ସର୍ଗ

ଅନିନ୍ଦ୍ୟ

সূচি

প্রাঙ্গর	৯
মধ্যযুগীয় জার্মান সাহিত্য	৩৭
৭৫০-১৫০০	
আদ্যধুনিক জার্মান সাহিত্য	৮০
১৫০০-১৭৮৯	
মধ্যধুনিক জার্মান সাহিত্য	১৫৪
১৭৮৯-১৯০০	
অন্ত্যধুনিক জার্মান সাহিত্য	৪৬০
১৯০০-১৯৪৫	
উত্তরাধুনিক জার্মান সাহিত্য	৫৩৪
১৯৪৫ থেকে অধুনা	

প্রাঙ্গর

যে-সময়ে মহাবীর আলেকজান্ডার^১ উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণে লিপ্ত, সেই সময়ে, ৩২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, একজন বিদগ্ধ গ্রিক, ম্যাসিলিয়ার পাইথেয়াস^২, তার শহর থেকে হিস্পানিয়া এবং ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূল বরাবর জিব্রালতার^৩ প্রণালি দিয়ে যাত্রা করে এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে রাইন নদীর মুখে একটি নতুন মানবগোষ্ঠী আবিষ্কার করেন, তাদের নাম টিউটোন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে, এই টিউটোন জনগোষ্ঠী রোমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অতঃপর এই মানবগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয় জার্মান (প্রতিবেশী) জনগোষ্ঠী।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮ অব্দ। ইউলিয়ুস ক্যাইজার জার্মান জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করার জন্য ভোসজ^৪ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ভোসজের যুদ্ধে জার্মান জনগোষ্ঠী পরাজিত হয়। তিনি জার্মানদের বলেন : “রাইন অঞ্চলের পথহারা জনগোষ্ঠী।”^৫ রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া জার্মান যোদ্ধাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য ইউলিয়ুস ক্যাইজার মনস্তির করেন। তিনি তার সেনাদলকে রাইন নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের নির্দেশ দেন। দশ দিনের মধ্যে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। অতঃপর ইউলিয়ুস ক্যাইজার তার সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হন। উদ্দেশ্য : জার্মেনিয়াকে আক্রমণ করে দখল নয় বরং জার্মান জনগোষ্ঠীকে রোমের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন করা, যাতে জার্মান জনগোষ্ঠী কখনো রোমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না হতে পারে। কিন্তু জার্মান জনগোষ্ঠী গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করার জন্য। এই সংবাদ পেয়ে ইউলিয়ুস ক্যাইজার বাধ্য হয়ে রাইন নদীর অন্যতীরে ফিরে আসেন। এমনকি রাইন নদীর সেতুটিও ভেঙে দেওয়া হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫-৫১ অব্দ। গৌলদেশের রাজ্যপাল হিসেবে ইউলিয়ুস ক্যাইজার জার্মান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরও দুটি অভিযান পরিচালনা করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫ অব্দ। চার লাখ ত্রিশ হাজার জার্মান রাইন নদী অতিক্রম করে গৌলদেশে পৌঁছতে চাইলে গৌলদেশের রাজ্যপাল হিসেবে ইউলিয়ুস ক্যাইজার তার

১ Alexander III (Macedon; Alexandros; 356 – 323 BCE).

২ Pytheas of Massalia (Pytheas Massiliensis; 320 – 306 BC).

৩ Gibraltar is a British Overseas Territory and city located at the southern tip of the Iberian Peninsula. It has an area of 6.7 sq km (2.6 sq mile).

৪ Vosges.

৫ *Commentarii de Bello Gallico* (Bellum Gallicum; *Commentaries on the Gallic War*), Gaius Iulius Caesar.

সেনাদল দিয়ে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। এই গণহত্যার জন্য রোমান রাষ্ট্রনায়ক ক্যাথো^৬ নিন্দা জানান। একদিকে, ইউলিয়ুস ক্যাইজার স্যুভি গোত্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। রোমান সেনাবাহিনী বিজয়ী হয়। স্যুভি গোত্রের নেতা অ্যারোভিসতুস রাইন পেরিয়ে পালিয়ে যান। অন্যদিকে, ইউসিপেট এবং টেনসটার্সের জার্মান উপজাতিকে গৌলদেশের উত্তর থেকে বহিষ্কার করেন ইউলিয়ুস ক্যাইজার।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩ অব্দ। ইউলিয়ুস ক্যাইজার^৭ (জুলিয়াস সিজার) তার সেনাদল দিয়ে রাইন নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে দ্বিতীয়বার অন্যতীরে এসে উপস্থিত হন। তখন তিনি তার *গ্যালিক যুদ্ধ*^৮ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, জার্মান জনগোষ্ঠীর কোনো দেবতা নেই, সম্পদ নেই, সামাজিক বিধিবিধান নেই, ফসলের জন্য কোনো জমি নেই, শুধু অরণ্য, তারা যাযাবর, এই অঞ্চল রোমের জন্য লাভজনক নয়।^৯ ইউলিয়ুস ক্যাইজার তার গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন যে, রাইন নদীর পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীর আলাদা; কারণ, পশ্চিম তীরে গৌলদেশ—উর্বর ভূমি; এখানে রোমানদের মতো দেবতা রয়েছে, সাধারণ আইনকানুন ও সামাজিক বিধিবিধান রয়েছে; ফলে সভ্য দেশ ও জাতি; তাই গৌলদেশকে রোমীয়করণ করা যত সহজ, ততই কঠিন রাইনের পূর্ব তীরকে করা; কারণ, পূর্ব তীরে যাযাবর জার্মান জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাই ইউলিয়ুস ক্যাইজার রোমান প্রজাতন্ত্রের গৌলদেশের পূর্বাঞ্চলীয় সীমানা হিসেবে রাইন নদী নির্ধারণ করেন। তিনি *জার্মেনিয়ার* জন্ম দেন। তবে এও সত্য যে, রাইন নদী সত্যিকার অর্থে রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রাকৃতিক সীমানা হওয়া সম্ভব নয়। রাইন নদীর অন্যতীরে অবস্থিত জার্মানির কিছু উপজাতি ছিল রোমানদের অধীনে, যেমন : বেলগ্যাই^{১০}। তাছাড়া ইউলিয়ুস ক্যাইজার তার অশ্বারোহী বাহিনীতে একদল সেনা নিয়োগ করেন যারা জার্মান জনগোষ্ঠী থেকে আসা। ইউলিয়ুস ক্যাইজার তার *গ্যালিক যুদ্ধ* গ্রন্থে জার্মান বর্বর জনগোষ্ঠীর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন ঠিকই কিন্তু তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার একটি অপূর্ণ বিবরণ শুধু দিয়েছেন। তারা ছিল প্রকৃতি পূজারি। তিনি লক্ষ করেছেন যে, এই শিকারি এবং যোদ্ধা জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য : তাদের জীবন স্বাধীন, কিন্তু কর্তব্যবোধ এবং অধিকারের অভাব, তারা আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম, শারীরিক পরিশ্রমে কঠোর। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তারা লুণ্ঠন অভিযান পরিচালনা করে স্থলভূমির সীমান্তবর্তী সমস্ত অঞ্চল নষ্ট করে দেয়। এই গ্রন্থে ইউলিয়ুস ক্যাইজার জার্মান জনগোষ্ঠীর প্রশংসা কিংবা অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি, কেবল তার পর্যবেক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। শীঘ্রই শান্তি ও যুদ্ধের মাধ্যমে রোমানদের কাছে তারা আরও পরিচিত হয়ে ওঠে।

৬ Marcus Porcius Cato (95 – 46 BC).

৭ Gaius Iulius Caesar (Latin : Iulius caesar; 100 – 44 BC).

৮ *Commentarii de Bello Gallico* (Bellum Gallicum; *Commentaries on the Gallic War*), Gaius Iulius Caesar.

৯ *Commentarii de Bello Gallico* (Bellum Gallicum; *Commentaries on the Gallic War*), Gaius Iulius Caesar.

১০ Belgae.

রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম গৌরবময় বছরগুলোয়, জার্মান জনগোষ্ঠী রোমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আংশিক ভয়ের এবং আংশিক সুনামের কারণে। স্টোইক দর্শন^{১১} প্রকৃতির এই অব্যাহত শক্তির জনগোষ্ঠীর নৈতিকতার আদর্শের উপলব্ধি করেছিল; অভিজাত স্টোইকরা এই জার্মান জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাধীনতার পরিপূর্ণতাকে দেখতে পেরে তাদের স্বাগত জানান, আর স্বদেশপ্রেমী দূরদর্শী রোমানরা এই জনগোষ্ঠীকে রোমের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচনা করেন।

৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দ। শীত। রোমান ঐতিহাসিক পুবলিয়াস কোর্নেলিয়াস ত্যাচিটুস^{১২} তার বিখ্যাত *জার্মেনিয়া* গ্রন্থের জন্য জার্মান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। *জার্মেনিয়া* গ্রন্থ থেকে জার্মান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, রোমান প্রজাতন্ত্রের বাইরে মধ্য ইউরোপের বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে ছিল জার্মান জনগোষ্ঠীর বসবাস। রোমানরা এই অঞ্চলকে একত্রে *জার্মেনিয়া* বলে। জার্মান জনগোষ্ঠীর এই বিশাল অঞ্চলটি ছিল রোমান প্রজাতন্ত্র ও শ্লাভ-অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত। এই বিশাল অঞ্চলটি বিভিন্ন সময় রোমানদের অধীনে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে শ্লাভ জাতিগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে পূর্বদিক থেকে জার্মান জনগোষ্ঠীর বিশাল এলাকায় অভিযান শুরু করলে এবং শ্লাভদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে টিকতে না পেরে জার্মান জনগোষ্ঠী রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। এই গ্রন্থ রচনা করে ত্যাচিটুস এই অসাধারণ জার্মান জনগোষ্ঠীর প্রতি রোমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, জার্মান জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড নবনির্বাচিত সম্রাট ট্রায়ানুসকে^{১৩} (রাজত্ব : ৯৮-১১৭ খ্রিষ্টাব্দ) রাজধানী রোম থেকে অনুপস্থিত রাখে, যদিও রোমে তার উপস্থিতি প্রবলভাবে কাজক্ষিত ছিল। একই সময়ে তিনি রোমের উচ্চবিলাসী ও অভিজাত শ্রেণির একটি চিত্রও অঙ্কিত করেছেন। যারা ছিলেন তার চারপাশে, তাদের অত্যধিক বিলাসিতার নৈতিক পরিণতির একটি চিত্রই এঁকেছেন। তার বিবরণে রয়েছে যাজকীয় কবিতার^{১৪} সুর, (কল্পনার মাধ্যমে অন্বেষণ করা হয় আধুনিক জীবন পরিত্যাগ করে আদিম গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা)। ত্যাচিটুসের মতে : জার্মান জনগোষ্ঠী পশুপালন ছাড়া অন্যকোনো সম্পদ আরোহণে অক্ষম; তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণ অধিকার এবং সুদপ্রথার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। তাদের পোশাক সাধারণ। তাদের রণসরঞ্জাম ত্রুটিপূর্ণ। তারা অপূর্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতোই রণসজ্জাকে অল্প মূল্য দেয়। তাদের খাদ্যের প্রধান অংশ ফল ও দুধ। তারা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তারা শহরে বাস করে না। প্রত্যেক গোত্র বা পরিবার একা ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, তাকে বা তার পরিবারকে যেখানে কাঠ ও মাঠ আকর্ষণ করে সেখানেই বসবাস করে। তারা চাঞ্চল্যকর বা উদ্বেজনাপূর্ণ

১১ Stoic Philosophy.

১২ Publius Cornelius Tacitus (56 – 120 AD).

১৩ Imperator Caesar Nerva Traianus (Born : Marcus Ulpius Traianus; 53 – 117 AD).

১৪ Pastoral Poem.

পরিবেশ এবং ইন্দ্রিয়ের কৃত্রিম লোভনীয় জিনিসের আকর্ষণের প্রতি অপরিচিত। তারা তাদের নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা সরল জীবনযাপন করে। তারা তাদের বিবাহবন্ধনকে ঐশ্বরিক বলে মনে করে এবং তা প্রাণপণে রক্ষা করে চলে। যদিও এই আভিজাত্য রোমান ইতিহাসবিদের বর্ণনায় অনেক আদর্শ উপাদান রয়েছে, তবুও এটিকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ত্যাচিভুসের সামনে প্রচুর পরিমাণ উপাদান থাকা সত্ত্বেও সেগুলো তিনি পরিত্যাগ করে, তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ থেকে এবং তার নিজস্ব মতামতের দ্বারা কিছুটা রঙিন করে এই গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। জার্মান জীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুপরিচিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের জীবনধারা, সামরিক রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ সম্বন্ধে একটি অপূর্ণ রূপরেখা মাত্র অঙ্কিত করেছেন। অবশ্য তিনি জার্মান জনগোষ্ঠীর বাজে অভ্যাসগুলো তুলে ধরতে কৃপণতা করেননি; যেমন, শান্তির সময় অলসতা, কঠোর পরিশ্রমে অনীহা-অপছন্দ; মদ্যপান, জুয়া এবং লড়াইয়ের প্রতি অমিত ভালোবাসা। তিনি অসংখ্য উপজাতি এবং গোষ্ঠীর একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। যাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। এবং অবিচ্ছিন্নভাবে অক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান শক্তির সৃষ্টির চিত্র। এই শক্তি সৃষ্টি হলে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রোমান বিজয় সাধিত হলেও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারবে না। সংক্ষেপে, এও স্পষ্ট যে, তার এই গ্রন্থে জার্মান জনগোষ্ঠীর যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থে আনন্দদায়ক এবং ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত। তিনি জার্মান জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বর্ণনা রেখে গেছেন। এটি ইতিহাসের জন্য মূল্যবান; কারণ, জার্মান চরিত্র সম্পর্কে তিনি যে চিত্র বা ধারণা দিয়ে গেছেন তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে এই জনগোষ্ঠীই রোমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল। ফলে এই গ্রন্থটি জার্মান বংশধরের কাছে অতি মূল্যবান সম্পদ।

ত্যাচিভুস তার গ্রন্থে জার্মান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন : জার্মান জনগোষ্ঠী কি অভিবাসী, নাকি স্বদেশেই উৎপন্ন হয়েছিল? তিনি স্বদেশেই উৎপন্ন হয়েছিল মতটি গ্রহণ করেন; কারণ, তার কাছে প্রথম অনুমানটি অসম্ভব বলে মনে হয়; তার মতে : জার্মান জনগোষ্ঠী যে অনুর্বর জমিতে বসবাস করত তা কখনো বিদেশিদের আকৃষ্ট করতে অসম্ভব। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ভিন্ন উত্তর দেয়। বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, পূর্ব আফ্রিকায় মানব জাতির আবির্ভাব, প্রায় পঁচিশ লাখ বছর আগে। প্রায় বিশ লাখ বছর আগে কিছু মানুষ পূর্ব আফ্রিকা ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য-এশিয়া-সহ এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি নতুন জায়গায় তারা বিরূপ অবস্থা, নতুন ধরনের আবহাওয়া ও জলবায়ু, ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থা, নতুন নতুন প্রাণী, অচেনা গাছপালা ইত্যাদির সম্মুখীন হয়। এতসব অচেনা অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবর্তিত হতে থাকে। অনেক অনেক বছর ধরে এরকম চলার পর, মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে, ফলে মানবজাতির বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের মতো

করে এসব প্রজাতির আলাদা আলাদা লাতিন নামকরণ করেছেন। প্রায় পাঁচ লাখ বছর আগে পশ্চিম ইউরেশিয়ায়^{১৫} মানুষের যে প্রজাতি বিকাশ লাভ করে বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন হোমো নিয়াভার্থালেনসিস^{১৬} (সংক্ষেপে নিয়াভার্থাল^{১৭}; অর্থ : নিয়াভার উপত্যকার মানুষ)। এই মানুষ বরফযুগে পশ্চিম ইউরেশিয়ার ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খুব ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। প্রায় তিন লাখ বছর আগে মানুষ প্রাত্যহিক কাজের জন্য আগুনের আবিষ্কার করে। প্রায় দুই লাখ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায় হোমো স্যাপিয়েনসের (আধুনিক মানুষের) আবির্ভাব ঘটে। প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে কিছু হোমো স্যাপিয়েনস পূর্ব আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপে এসে পৌঁছে। এখান থেকে তারা খুব দ্রুত পুরো ইউরেশিয়ায় বিস্তার লাভ করে।

হোমো স্যাপিয়েনস যখন মধ্য-এশিয়ায় আসে তখন ইউরেশিয়ার বেশির ভাগ এলাকা অন্যান্য প্রজাতির মানুষে ভরপুর ছিল। যখন হোমো স্যাপিয়েনস ইউরেশিয়ায় পৌঁছে তখন তাদের সাক্ষাৎ হয় নিয়াভার্থালদের সঙ্গে। নিয়াভার্থালরা পেশিবহুল ছিল। তারা হোমো স্যাপিয়েনসদের চেয়ে ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেক ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। তাদের মস্তিষ্কের আকারও হোমো স্যাপিয়েনসদের চেয়ে বড় ছিল। তারা অস্ত্রের ব্যবহার জানত, আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এবং সকল রকম শিকারে হোমো স্যাপিয়েনসদের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী ছিল। যখন হোমো স্যাপিয়েনস নিয়াভার্থালদের এলাকায় (ইউরেশিয়ায়) ছড়িয়ে পড়ে তখন গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটে। হোমো স্যাপিয়েনস ও নিয়াভার্থাল এই দুই জনসমষ্টি স্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে থাকে। এই দুই দলের মধ্যে একরকম বৈরীভাব দেখা দেয়। তার ফলস্বরূপ যুদ্ধ। যে যুদ্ধের মেয়াদ শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগে নিয়াভার্থালদের বিলোপ সাধিত হয়। তাদের বিবর্তনও থেমে যায় তখনই। তাদের জিনগলোও^{১৮} শেষ হয়ে যায়। হোমো স্যাপিয়েনস পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। এও সত্য যে, হোমো স্যাপিয়েনসরা যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই অন্য প্রজাতির মানুষের বিলুপ্তি ঘটেছে। এটি গণহত্যার কারণে। না অন্যকোনো কারণে হয়েছে সেটি গবেষণার বিষয়। তবে এও সত্য যে, হোমো স্যাপিয়েনসের কারণে শুরু হয় জ্ঞানের উন্মেষ, ভাষার উত্থান, ইতিহাস। বিজ্ঞান বলে, মানুষের হঠাৎ এই বুদ্ধি বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি নেহাতই জেনেটিক দুর্ঘটনা।

মস্তিষ্কের গঠন একেবারে বদলে যায়। চিন্তা করার ক্ষমতা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। ফলে মানুষের নতুন নতুন চিন্তাকে, মনের ভেতরকার ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। সেই মাধ্যমটাই হচ্ছে ভাষা : সাংকেতিক ভাষা নয়, একেবারে আদি ও অকৃত্রিম

১৫ ইউরোপ এবং এশিয়ার একত্রিত এলাকায়।

১৬ Homo Neanderthalensis.

১৭ Neanderthals.

১৮ Gene.

মুখের ভাষা। এই মুখের ভাষা মানুষের একক আবিষ্কার ছিল না। মানুষের দূর সম্পর্কের আত্মীয় বানরও স্বল্প পরিসরে হলেও ভাষার ব্যবহার করে। সবুজ বানর নামক একটি প্রজাতির ওপর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এরা সিংহ দেখলে সবসময় একটা নির্দিষ্ট আওয়াজ করে; অর্থ : দ্যাখ, দ্যাখ, সিংহ। ঈগল দেখলে সম্পূর্ণ অন্যরকম আওয়াজ করে; অর্থ : দ্যাখ, দ্যাখ, ঈগল। কিন্তু মানুষের ভাষা আবিষ্কারের বিশেষ সুবিধা এই যে, মানুষের যেহেতু জটিল ও একটি চমৎকার মস্তিষ্ক রয়েছে, সে শব্দের পর শব্দ বিস্তার করে সবকিছু বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হল; যেমন : বানর যেখানে বলে, দ্যাখ, দ্যাখ, সিংহ; সেখানে মানুষ বলতে সক্ষম হল, পালাও, পালাও; নিকটেই সিংহ। তারপর যদি মানুষ বেঁচেবর্তে ফিরতে পারে, সারা জীবন তার জাতিগোষ্ঠীর কাছে এই গল্প করে বেড়াবে : কোথায়, কখন সে সিংহটিকে দেখেছিল, সিংহটির গায়ের রং কী ছিল, কীভাবে সে বেঁচে ফিরেছে ইত্যাদি। তাছাড়া তথ্যপ্রমাণ সাক্ষ্য দেয় যে, গল্পই আদিম মানুষের ভাষার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীকে একত্র করে গড়ে তুলেছিল স্থায়ী, বড় সমাজ। মানুষ যখন ভাষা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, মোটামুটি সেই মুহূর্ত থেকেই সে গল্প বলতেও শুরু করে। আর এই গল্প বলার মধ্য দিয়ে সে এক নতুন অস্তিত্ব— আত্মগত অস্তিত্ব— নির্মাণ করতে সক্ষম হয় তার চারপাশে, যা এতোদিন ছিল শূন্যে বাঁধা। ভাষা তাকে হঠাৎ মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। অতঃপর বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীতে জন্ম নেয় একটি সর্বসাধারণ শ্রুতিগাথার। এই শ্রুতিগাথাই জন্ম দেয় ধর্মবিশ্বাসের। তখন এই ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় কাল্পনিক বাস্তবতায়, যার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। মানুষ স্রেফ গল্প বলেই হাজার বছরের প্রথা ও সংস্কার ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। এই মানুষের অদ্ভুত ক্ষমতা।

আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েনস) যেসব কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার জন্ম দেয় সেইসব পরবর্তীতে সুসম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সেই সত্তর হাজার বছর আগেকার পূর্ব আফ্রিকার মানুষেরই বংশধর, সবাই নির্ভেজাল হোমো স্যাপিয়েনস। তেরো হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বেঁচে থেকে একমাত্র মনুষ্যপ্রজাতি হোমো স্যাপিয়েনস।

প্রায় বারো হাজার বছর আগে শুরু হয় কৃষি বিপ্লব : চাষাবাদ ও পশুদের পোষমানানো ও স্থায়ী বসতি স্থাপন। এই সময় মানুষ যখন শিকার ছেড়ে পুরোপুরি চাষবাসে মন দেয়, তখন সে ভাবে, চাষাবাদ করলে তার জীবন অনেক সুখের হবে। খাবারের সন্ধান আর পথে পথে ঘুরতে হবে না। ঘর থেকে কয়েক পা ফেললেই খাদ্যের সন্ধান মিলবে। পরিবার নিয়ে বাড়িতে বসেই আমোদানন্দ করা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বাড়তি ফসল মানেই বাড়তি সুখ নয়। এই বাড়তি ফসল ফলাতে গিয়ে মানুষকে দিনরাত খাটতে হয়। মানুষের শরীর এই কষ্টের জন্য প্রস্তুত নয়। মানুষের শরীর হচ্ছে আরাম-বিশ্রাম-উপভোগের জন্য। সে খাবে-দাবে, ঘুরবে-ফিরবে; পথের মধ্যে যা কুড়িয়ে পাবে তাই দিয়ে পেটের ক্ষুধা মেটাবে; কিন্তু ফসল ফলাতে গিয়ে তাকে

নিজের সঙ্গে অনেক আপস করতে হয়। ভালো ফসল ফলাতে মসৃণ শস্যক্ষেত্র তৈরি করতে নুড়ি, পাথর, আগাছা নিড়াতে মানুষ সকাল-সন্ধ্যা খেটে মরে। এই আগাছা নিড়ানোর কাজে মানুষকে একটা বিশাল সময় ব্যয় করতে হয়। মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও অনেক বেশি। শুধু বৃষ্টির জল দিয়ে তাদের পিপাসা মিটানো সম্ভব নয়। ফলে তাদের পিপাসা মেটানোর জন্য মানুষকেই দূর-দূরান্ত থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। গবাদি পশু দিয়ে মেটানো হয় তাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। স্থায়ী বসতি গড়ার পর, মানুষ বছর বছর বাচ্চা নেওয়া শুরু করে। নতুন মানুষের কারণে বসতিগুলো হয়ে ওঠে ঘিঞ্জি আর রোগজীবাণুর আড়ং। যে কয়টা মৃত্যুবরণ করে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জন্ম নিতে থাকে। এই বাড়তি মুখের অল্প জোগানোর জন্য মানুষকে আরও বেশি বেশি ফসল ফলাতে হয়। আরও বেশি ফসল মানেই আরও বেশি খাটনি। তাছাড়া পৃথিবীতে সবসময়ই এমন কিছু মানুষ ছিল যারা নিজেরা কোনো কাজ করত না; বরং অন্যের পরিশ্রমে ভাগ বসিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখত। কৃষকের এই ফসলে বাইরের মানুষ (সম্রাসী) এসে আক্রমণ চালাত। সম্রাসীরা কৃষকের ফসলের ভাগ দাবি করত। অবশ্যই মুখের ভাষায় না, অস্ত্রের ভাষায়। তাদের প্রতিহত করার জন্য কৃষকদের একটা অংশকে, কখনো-বা গোটা গোত্রকেই যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হতো। দিনে চাষবাস, আর রাতে ফসল পাহারা— জীবনটা একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে। কৃষি মানুষকে যে সুখস্বপ্ন দেখিয়েছিল, সময়ে তা নির্মম ফাঁদে পরিণত হয়। কৃষি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম ফাঁদ। সেই যে মানুষ ফাঁদে পা দেয়, তারপর থেকে একটার-পর-একটা ফাঁদে পড়তেই থাকে। কৃষি যতটা বিপ্লব ঘটায়, তার চেয়ে বেশি ধোঁকা দেয় মানুষকে। কৃষি আশীর্বাদ নয়, বরং দেখা দেয় অভিশাপরূপে। ইতিহাসের প্রতিটি ধাপই মানুষের সঙ্গে ছলনা করেছে। শুরুতে সে একটা সুখী, সুন্দর, আরামদায়ক জীবনের লোভ দেখিয়েছে। পরে ঠিকই তাকে আগের মতোই কিংবা আরও কষ্টসাধ্য একটা জীবনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, প্রথম রাজ্যস্থাপন, মুদা ও বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের প্রচলন শুরু হয়। প্রায় সকল বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসেই একজন পরম সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়েও তারা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী নয়; কারণ, বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস : এক এবং বহু দুই রকম ঈশ্বর জড়াজড়ি করে অবস্থান করে। তবে পরবর্তীতে বহু-ঈশ্বরবাদই একেশ্বরবাদের জন্ম হয়, যদিও একেশ্বরবাদ শুভ ও অশুভ দুই পরম শক্তিকে অস্বীকার করে না। একেশ্বরবাদ বলে শুভসত্তা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছে। ইচ্ছাশক্তি দিয়েছে। সেই ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষ শুভ ও অশুভের পার্থক্য করতে পারে। অশুভসত্তা না থাকলে কোনো অশুভ থাকত না আর মানুষ শুভ-অশুভ পার্থক্যও করতে পারত না। শুভ-অশুভ পার্থক্য করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই রয়েছে।

প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে প্রথম আরিয়ান (আর্য, ইরানি) সম্রাট আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের সারগন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বৈশ্বিক মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৭৬ অব্দ। ইরাক, ইরান ও

সিরিয়া মিলে বিস্তৃত ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের সম্রাট হামুরাবি কর্তৃক সর্বভৌম রাজনৈতিক আদেশ (হামুরাবি সংহিতা) জারি করা হয়। হামুরাবি সংহিতায় সেই সময়ের সমস্ত আইনকানুন লেখা আছে। হামুরাবি সংহিতা গুরু হয়েছে আনু, ইনলিল ও মারদুক ত্রয়ী দেবতার নামে। বলা হয় : দেবতারা হামুরাবিকে দুষ্টির দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। হামুরাবি সংহিতার দুটি আইন।

১। ক. একলোক যদি অন্যলোকের চোখ উপড়ে ফেলে আর দুইজনই যদি অভিজাত শ্রেণিভুক্ত হয়, তবে অপরাধীরও চোখ উপড়ে ফেলা হবে। খ. এক অভিজাত যদি এক সাধারণ মানুষের চোখ উপড়ে ফেলে, তবে তার ষাট তুলা রৌপ্য জরিমানা দিলেই চলবে। গ. এক অভিজাত যদি এক দাসের চোখ উপড়ে ফেলে, তবে সেই দাসকে যেই দামে কেনা হয়েছে, তার অর্ধেক জরিমানা হিসেবে দিলেই চলবে।

২। ক. এক অভিজাত পুরুষ যদি এক অভিজাত নারীকে গর্ভবতী করে ফেলে আর কোনো কারণে সন্তানটি যদি মারা যায়, সেটা গর্ভাবস্থায় কিংবা প্রসবের সময় হোক, তবে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দশ তুলা রৌপ্য দিলেই চলবে। আর যদি কোনো কারণে মহিলাটি মারা যায় তবে শাস্তি হিসেবে সেই লোকের কন্যা সন্তানটিকে হত্যা করা হবে। খ. একই ঘটনা যদি এক অভিজাত পুরুষ এক সাধারণ নারীর সঙ্গে ঘটে, তবে জরিমানা হিসেবে দিতে হবে পাঁচ তুলা রৌপ্য। আর সেই মহিলা যদি মারা যায়, তবে আরও তিরিশ তুলা রৌপ্য। অভিজাত পুরুষটির কন্যা সন্তানটি এ যাত্রায় বেঁচে যায়। গ. ঠিক এই ঘটনাই এক দাসীর সঙ্গে ঘটলে অভিজাত পুরুষটিকে দিতে হবে যথাক্রমে দুই তুলা আর বিশ তুলা রৌপ্য।

হামুরাবি সংহিতা অনুযায়ী পুত্র ও কন্যা হচ্ছে পিতা ও মাতার সম্পত্তি। অভিজাত পিতা পাপ করলে তার দায় ভোগ করতে হয় তার নিরপরাধ কন্যাকে। নারীদের জন্য হামুরাবি সংহিতা ছিল কঠোর। কঠিন ছিল সাধারণ মানুষের জন্যও। স্পষ্টতই, অভিজাত মানুষের জন্য একরকম আইন, আর সাধারণ মানুষের জন্য আর-একরকম আইন। সমাজের প্রতি যেন দায়িত্ববোধ তৈরি হয় তার জন্য বেশ কঠোর কিছু নিয়মকানুন রয়েছে হামুরাবি সংহিতায়। যেমন, কোনো একটা পাড়ায় কোনো বহিরাগত এসে ছিনতাইয়ের শিকার হলে পাড়ার সবাই মিলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এটি পাড়ায় ছিনতাইকারী পোষার শাস্তি।

ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের বিশেষ করে ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে মানুষ যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই তাদের খাদ্যব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেয়। কে কতটুকু ফসল ফলাচ্ছে, কার কাছ থেকে কতটুকু খাজনা নিতে হবে তা গ্রামপ্রধান বা অঞ্চলপ্রধানের মগজে কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। গ্রামপ্রধান বা অঞ্চলপ্রধানের এই দুর্দিনে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, এগিয়ে আসেন কিছু সুমেরীয় বিজ্ঞানী। সুমেরীয় বিজ্ঞানীরা দুইরকম পদ্ধতি বা চিহ্ন ব্যবহার করে তার সমাধান করেন। **সংখ্যাভিত্তিক** : এক, দশ, ষাট, ছয়শত, ছত্রিশ শত, ছত্রিশ হাজার— এই বিশেষ সংখ্যাগুলোর জন্য চিহ্ন ব্যবহার করেন। সময় গণনার

ছয়ভিত্তিক সংখ্যা। একদিনও হয় চব্বিশ ঘণ্টায়। সেও ছয় দ্বারা বিভাজ্য।
চিত্রভিত্তিক (পিটোগ্রাম) : মানুষ, পশু, পাখি, ঘর, বাড়ি ইত্যাদি। মানুষ, পশু, পাখি, ঘর, বাড়ির চিত্রচিহ্ন দিয়ে তারা ভাষার কাঠামো তৈরি করেন। বর্তমান বর্ণমালার বিবর্তন লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিটা বর্ণই এসেছে কোনো-না-কোনো চিত্রচিহ্ন থেকে; যেমন, সুমেরীয় জনগোষ্ঠী ষাঁড়কে আলেফ^{১৯} বলত, এ থেকেই গ্রিক আলফা, আরবি আলিফ আর ইংরেজি অ্যা-এর জন্ম। ঘরকে সুমেরীয় জনগোষ্ঠী বেথা^{২০} বলত, এ থেকেই গ্রিক বিটা, আরবি বে আর ইংরেজি বি-এর জন্ম। রুটিকে সুমেরীয় জনগোষ্ঠী লেহেম^{২১} বলত, এই লেহেম থেকেই গ্রিক ল্যামডা, আরবি লাম আর ইংরেজি এল-এর জন্ম। সুমেরীয় বর্ণমালা অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা নয়। এই বর্ণমালা ব্যবহার করে মূলত সাম্রাজ্যের কাজ করা হতো। প্রথম রাজকীয় যে বার্তা উদ্ধার করা হয়েছে এ পর্যন্ত তা এরকম : ২৯,০৮৬ মণ বার্লি, ৩৭ মাস, কুশিম। অর্থ সম্ভবত এরকম : বিগত ৩৭ মাসে ২৯,০৮৬ মণ বার্লি সংগ্রহ করা হয়েছে; সাক্ষরে—কুশিম। প্রথম বার্তা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ধর্মীয়, সামাজিক, আধ্যাত্মিক কোনো উঁচু স্তরের চিন্তা নয়; বরং পেটের চিন্তা।

প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে পূর্ব ইরানের গ্রাম্য সংস্কৃতিতে প্রোথিত জরথুষ্ট্রবাদের আবির্ভাব ঘটে এবং পারসিক (ইরানি) সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়।^{২২} একেশ্বরবাদী এই ধর্মমতে : মহান জরথুষ্ট্র ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত একজন বার্তাবাহক। তিনি মানুষের নিকট ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেন। জরথুষ্ট্র অনেক দেবতার উপাসনা না করে একক দেবতা আহুর মাজদার উপাসনার জন্য তার অনুসারীদের প্রভাবিত করেন। ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে জরথুষ্ট্র একত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু তার একত্ববাদ এবং দ্বৈতবাদ পরস্পরবিরোধী নয়, বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্পেনতা মাইনু এবং আওরা মাইনু দুই জমজ সত্তা। স্পেনতা মাইনু হল সত্য ও শুভর প্রকাশক এবং আওরা মাইনু মিথ্যা ও অশুভের নির্দেশক। উভয়ের জন্মই পরম একক সত্তা আহুর মাজদা থেকে, ‘আশা’ বা সত্য এবং ‘দ্রুজ’ বা মিথ্যা থেকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে। সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য, সৎ-কর্ম এবং অসৎ-চিন্তা, অসৎ-বাক্য, অসৎ-কর্ম বেছে নেওয়ার মাধ্যমে উভয়ের প্রকাশ। জমজ এই দুই সত্তার নির্বাচনের ধারণাই দ্বৈতবাদের জন্ম দেয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শুভ-অশুভের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে আদিম তাৎপর্য বিদ্যমান। আহুর মাজদাই আকাশ-মৃত্তিকা, আলো-অন্ধকার এবং দিন-রাত সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছে শুভ ও অশুভ। সৃষ্টির প্রসঙ্গে তিনটি কালের কথা বলা হয়েছে : বুন্দাহিশন (সৃষ্টি), গোমেজিশন (দুই বিপরীত শক্তির সমাবেশ) এবং উয়িজারিশন (পৃথকীকরণ)। জগতে অস্তিত্বশীল সবকিছুই এজন্য দুটি অবস্থায় বিরাজমান : আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক। একটা ভাব এবং অন্যটা বস্তু।

১৯ Al eph.

২০ Bêth.

২১ Lehem

২২ *The Encyclopedia of Religion*, vol. 15, page 580.

